IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

গ্রন্থাগারের ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় রঙ্গনাথনের পঞ্চনীতি

(GRANTHAGARER ITIHAS O RABINDRANATHER VABNAY RANGANATHNER PANCHANITI)

Bithusmita Mandal
Ex-Student, Dept. of History
Jadavpur University, Kolkata-700032

প্রত্নতত্ত্বগত প্রমাণে বিশ্বের প্রথম গ্রন্থাগারের পরিচয় পাওয়া যায়- ব্যাবিলনীয় সেমেটিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম সারগনের (Sargon-I) রাজধানী - আক্কাদে (Akkad) অথবা আগাদে (Agade) আনুমানিক খ্রি: পূর্ব সপ্তম শতকে এই গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল। বিশ্বের প্রথম গ্রন্থাগারিকের যে নাম পাওয়া যায় তিনি ব্যাবিলনীয়, তাঁর নাম (আমিলানু) Amilanu ভারতের গ্রন্থাগারের ইতিহাস শুরু হয় বৌদ্ধ সভ্যতার শেষ অধ্যায় থেকে গ্রন্থাগারের উৎস খুঁজে পাওয়া যায় পালি শব্দ 'পিটক' থেকে। হস্তলিখিত বিষয়ের পাণ্ডুলিপি পিটকে রাখা হত। 'সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রথমচিন্তা করেছিলেন জুলিয়াস সিজার 'সকলেই লেখাপড়া শিখুক এই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রাচীন গ্রন্থাগার মূলত গ্রন্থের সংগ্রহ, প্রচলিত অর্থে আমরা তাই বুঝি। বই হচ্ছে মানুষের দেখা জানা বা অভিজ্ঞতার লিখিত দলিল। আধুনিক সভ্য মানব সমাজের পার্থক্য সূচিত করেছে লেখার আবিষ্কার। যুগ থেকে যুগান্তরে মানুষের জ্ঞান ও তার কর্ম কীর্তিকে পৌঁছবার কাজে কথ্য ভাষা অপারগ। তাই আজ থেকে বিশ বা তিরিশ হাজার বছর আগে প্রস্তর যুগের মানুষ গুহায় অংকন করে, পাহাড়ের গাইয়ে খোদাই করে তাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার কথা অপর যুগের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। বিশিষ্ট গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানী গ্রন্থাগারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন" A Collection of books assembled for use as against collection's assembled for sale, for display, for the pride of possession or for any of the purposes for which books may be assembled. আরও সহজ ভাবে বলা যায় যে গ্রন্থাগার ব্যবহারকরীর জন্য আপ টু ডেট তথ্য সংগ্রহ সংরক্ষণ ও চাহিদা মাতৃবিতরণ করে তাকে আধুনিক গ্রন্থাগার বলে।

গাছের ছালকে পরিষ্কার করে নিয়ে তাঁর উপর লিখেছে প্রায় সকল দেশেরই লিখেয়েরা। কলদিয়রা (Chaldes) গাছের ছালকে বলত (Liber) এই থেকে ল্যাতিন লিবর (Libre)-যার মানে বই লাইব্রেরি শব্দটির উদ্ভব এই থেকে। চীনা সভ্যতা ও অতি প্রাচীন। অন্তত হাজার হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে সুষ্ঠ লিখন পদ্ধতির নিদর্শন মেলে চীনে। লিখবার সামগ্রিক হিসাবে দেখা যায় হাড়, কচ্ছপের খোল বাঁশ, কাঠ, রেশম, ও সুতিবস্ত্রের ব্যবহার। সামগ্রী ভেদে লেখা হত চোখা অস্ত্র, পালকের কলম, এবং তুলি দিয়ে। ভারতবর্ষে লেখেন সামগ্রীর প্রাচীন নিদর্শন মেলে গাছের ছাল, ভুজপত্র, তালপাতা, এবং বাঁশ ও কাঠ ইত্যাদি। মধ্যেযুগে বই রাখা হত মঠে বা গীর্জায়। ভারত তিব্বত প্রভৃতি দেশে ও মন্দিরে পুঁথি রাখার নজির মেলে। ভারতে দেখা যায় পন্ডিত আর পুরোহিতদের দখলে পুঁথি থাকত। পন্ডিতেরা টোলে চতুস্পাঠীতে ছাত্র ও শিষ্যদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে পুঁথি রাখত। বাসুদেব সার্বভৌমের কাহিনি দ্বারা জানা যায় যে মিথিলার নৈয়ানিক পন্ডিত পক্ষধর মিশ্রর টোলে অধ্যয়ন করে নিয়ে আসেন নবদ্বীপে ন্যায় চর্চার পত্তন করেন। সে যুগে প্রায় সবদেশেই শিকল দিয়ে গ্রন্থ আটকে রাখার রেওয়াজ ছিল, যাতে করে চুরি না হয়। ভারতে হিন্দু, বৌদ্ধযুগের গ্রন্থ গৌরব কম ছিলনা তক্ষশিলার গ্রন্থাগার ষষ্ঠ খ্রি: সুসমৃদ্ধ ছিল। বিজাপুরের "বিদ্যাপুরি এবং নগর কোটের জ্বালামুখী

মন্দিরের পুঁথি সংগ্রহ ছিল বিশিষ্ঠ ও গৌরবের সামগ্রী। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের, নাম তো বিশ্ববিখ্যাত। এখানে বিবিধ বিষয়ের শিক্ষা চর্চার জন্য দেশ বিদেশ থেকে বিদ্যার্থী আসতেন। এখানকার গ্রন্থগৃহ যাকে বলা হত জ্ঞান ভান্ডার - তার নাম ছিল -"রতনগঞ্জ' তিনটি স্বতন্ত্র বাড়ি নিয়ে ছিল এই জ্ঞান ভান্ডার রত্নসাগর, রত্নদধি, রত্নরঞ্জক

গ্রন্থের উপাদান কি কি তা অবগত করার জন্য:-(১) কাগজ, (২) মুদ্রণ (৩) চিত্রণ (৪) গ্রন্থন (৫) গ্রন্থের মুদ্রণ। প্রাচীন ব্যাবিলনও আসিরিয়ার লোকেরা ব্যবহার করেছে মাটির ফলক/চাকতি (Clay Tablet)। ২. মিশরের লোকেরা প্যাপিরাস (papyrus) নামক ঘাস এবং ভারতীয়রা ভূর্জপত্র ও তালপাতা।

প্যাপিরাস পর্যন্ত কাগজের যেরূপ সম্পর্কে আমরা দেখলাম - কাগজ তৈরির কোন সূক্ষ্ম কৌশল উদ্ভাবিত হয়নি কিন্তু মানুষ ফিব্রিনস পদার্থ কে মন্ড করে তার থেকে কাগজ প্রস্তুত করতে শিখল। অনেকে মনে করেন বা অনুমান করেন কীটপতঙ্গের কাছ থেকে মানুষ শিখেছে এই কৌশল, বোলতা ভিমরুল, মৌমাছির চাক দেখতে অনেকটা কাগজের মতো এবং তা গাছ পালা জাত পদার্থ থেকেই তৈরী।

সে যাই হোক, আধুনিক কাগজ সর্ব প্রথম তৈরী করার গৌরবটি চিনকেই দেওয়া হয়। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মতে চীনারাই প্রথম জৈব পদার্থকে মন্ডে প্রিন্ট করে কাগজ তৈরীর উপায় উদ্ভাবন করেন। 105 খ্রিস্টাব্দে (Tasai Lung) নামে এক ব্যক্তি তদানীন্ত সম্রাটকে সরকারি ভাবে জানিয়ে দেন যে কাগজ তৈরির নতুন উপায় আবিস্কৃত হয়েছে। Tasai Lung নিজেই আবিষ্কার করতে পারেন বলে তাঁকে সম্রাট কর্তৃক পুরস্কৃত করা হয়েছিল এবং চীনের ইতিহাসে তাঁকেই কাগজ তৈরির জনক বলা হয়। চীনের এ আবিষ্কারের কথাটি সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে তুর্কি স্থান থেকে প্রাপ্ত খ্রিস্টীয় তৃতীয় থেকে অষ্টম শতাব্দীর কাগজ পরীক্ষা করে।

কাগজ মনুষ্য সভ্যতার একটি অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার। অতি ব্যবহারের ফল আজ আর এতো বিস্ময়ের কিছু পাই না। কিন্তু একটু ভাবলেই একথা নিশ্চয় আশ্চর্য ঠেকবে যে কেমন করে তুলা, কাঠ, ঘাস পাতা ইত্যাদি থেকে আমরা কাগজ পাচ্ছি এবং ছিন্নবস্ত্র থেকে কাগজ পাচ্ছি। গ্রন্থের উপাদানগুলির মধ্যে শীর্ষ স্থানীয় হলো লেখা যাবে কিসে, বা ছাপায় হবে কিসে, তাই গ্রন্থের উৎপত্তিই বা হবে কি করে?

কাগজ হল লেখার আধার। আধুনিক জগতে পদার পনের পূর্বে অনেক বিবর্তনের অনেক সোপান অতিক্রম করতে হয়েছে। এই কাগজ নামক বস্তুটির অর্জন করার জন্য। আদিরূপ: লেখেন দ্রব্য - সভ্যতার ইতিহাস একটু নাড়াচাড়া করলেই তা বোঝা যাবে। ফুরড্রিনের যন্ত্র নামক প্রথম কাগজের কল ফ্রান্সে আবিষ্কৃত হয় 1798 খ্রিঃ।

ভারতে কারখানা চালু হয় বাংলার বালি শহরে 1870 খ্রি: আরো আগে অবশ্য 1711 তে মাদ্রাজে এবং) 1825 এ শ্রীরামপুরের মারশম্যান সাহেবের কাগজের কল। কাগজের কাঁচামাল:- ১.ছিন্নবস্ত্রখন্ড- তুলোর ও রেশমের, ২.পাঠ শন ও এই জাতীয় অন্যান্য দ্রব্য, ৩.বাঁশ ও খড়, ঘাস।

চায়না মার্বেল, নিউস প্রিন্ট, পোষ্টার, রেমি, টিস্যু, গ্রেইনেড, ইন্ডিয়া, জাপানি, লেজার, ভেলাম, এয়ানটিক, আর্ট, বন্ড ব্যাঙ্ক, blotting কাগজের কালির, ও ছাপার বিভিন্ন ধরন ও প্রকার জানার পরেই বই ছাপার কথা বিবেচনা করা হয় –

কাগজের বৃত্তান্ত জানার পর আমাদের উৎসুক্য জাগে কি করে এই কাগজের ওপর ছাপা হয়। যে ভাষাতেই ছাপা হোক ছাপার কাজটা দঁড়িয়ে আছে লিপি ও বর্ণমালার ওপর। মানুষ আগে মনের ভাব আঁচড় কেটে প্রকাশ করতে শিখেছে, তার পর সেই আঁচড়গুলি থেকেই বর্ণমালার সৃষ্টি করেছে তাই ছাপার কাজের আলোচনা প্রসঙ্গে লিপি ও বর্ণমালার ইতিহাস কিছু জানা প্রয়োজন।

আমরা যাকে ভাষা বলি তা হোল আমাদের মনের ভাব প্রকাশ একটি উপায়। এর মূলে আছে সঙ্কেত, যখন সংকেত কে অঙ্কিত করি তখন হয় লিপি। তাই এখানে চিত্র লিপির কথা আসে। আমরা প্রথমে চিত্র লিপি দুই প্রকারের ধরণ পাই- যথা :- ১.অক্ষর, ২.প্রকৃত বর্ণমালা। আবার লিপি যদি অক্ষরের প্রতীক হলে অসুবিধা হয়। উদাহরণ- রাজা কথাটি সহজে ভাগ করা যায় রা- জা। কিন্তু রাষ্ট্রকে ভাগ করা যায় কি ? এক্ষেত্রে ধ্বনি লিপির প্রতীক। কারণ বর্ণমালার এক একটা বর্ণ যত দূর সম্ভব একটি মাত্র বিশুদ্ধ ধ্বনি কে প্রকাশ করে। তবে ধ্বনি লিপি একে বারে সরাসরি চিত্র লিপির পরেই অবস্থা নয়। এদের মাঝামাঝি একটা অবস্থা ছিল যেখানে লিপির পর্যায়ে পড়ে কিউনিফর্ম, হায়ারোগ্লিফিক, হ্যারেটিক ও ডিমোটিক লিপি। এর পরে কিউনিফর্ম, হায়ারোগ্লিফিক প্রচলন দেখা যায়।

আধুনিক গবেষণা মতে বর্ণমালার আদি জন্মভূমি হবার গৌরব অর্জন করেছে - সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন। সেমিটিক জাতির অবদান হল বর্ণমালা। অবশ্যই এটা ঠিক যে এই আবিস্কারের মূলেছিল কিউনিফর্মও মিশরীয় লিপির প্রভাব ও অনুপ্রেরণা।

কাগজের পরেই মুদ্রণের অপরিহার্য সামগ্রী কালি কালি এক প্রকার তরল রঙিন পদার্থ যার রং অন্য পদার্থের উপরে সংক্রমণ করা যায় প্রায় 2500 খ্রি: পূর্বাব্দে মিশর, চীন, প্রভিতি দেশে ভাষার কালির চলন প্রাচীনতম আমল থেকে ছিল ভারতবর্ষেও। প্রাথমিকভাবে ভুসা আর গঁদ জাতীয় আঠা মিশিয়ে শক্ত কাঠির মত করে নিয়ে জলে ডুবিয়ে ডুবিয়ে নিয়ে লেখা হত। এই জাতীয় কালির কাঠি নানা রকমের বনজ পদার্থ বা রক্ত মিশিয়ে রঙ্গিন করা হত বা যেত .পরবর্তীকালে যাতে করে কাগজে কালি থেবড়ে না যায়, এবং চট করে শুকিয়ে যাওয়ার জন্য বাজারের লৌহজ লবন (Iron Salt) ব্যবহার করা হয়েছিল।

ছাপাখানার কালি তৈরির প্রণালী স্বতন্ত্র ধরণের রঙটি তিসি রেড়ি জাতীয় তৈলের মাধ্যমে বিকীর্ণ করা হয়, তার পর শিরীষ, রজন বার্ণিশের কাজের জন্য- এই আঠা প্রস্তুত করে পরবর্তীকালে ছাপায়ের কাজের জন্য কালি এমন ভাবে তৈরী হয়, যার মধ্যে এলে ও ক্ষতি না হয়, এবং অল্পত্বেই যেন উঠে না যায় এবং রং স্পষ্ট হয় ওঠে। ছাপার কালি গুড়ের মত চট চটে বা আঠালো না হলে হরফের উপরে বসে না বরং গড়িয়ে যায় তাই শিরীষ, গ্লিসারিন ইত্যাদি দিয়ে প্রস্তুত শক্ত অথচ মোলায়েম বলনে কালি লাগিয়ে বিন্যস্ত হরফের উপরে বুলিয়ে শেষ ছাপ তোলা হয়। এর পরে মানুষের মনের মধ্যে উৎসুক্য জাগে মুদ্রণের দ্বারা আরও কি করে জ্ঞান অর্জনের পক্ষে সুবিধা হবে তা নিম্নে বর্ণিত হল।

বই-এর মূলে আছে ভাষা। লিখিত ভাষা, কথিত ভাষার লিখিত রূপ। এখন প্রশ্ন আসে ভাষা কি? ভাষার বিনিময় আকারে ইঙ্গিতে ও হতে পারে। অনেকে কথা যা- ও- যে কোন কথা না বলে। কিন্তু এই পদ্ধতি জনে জনে সীমাবদ্ধ কথা বললে তা পাঁচ জনে শোনে বোঝে। আর সেই কথা গ্রন্থ বদ্ধ হলে দেশ কালের গন্ডী পেরিয়ে যায়। বিশ্বজনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। একালের বই বলতে আমরা বুঝি মুদ্রিত গুচ্ছবদ্ধ পত্রসমষ্টি বুঝি। কিন্তু কাগজ হল হালের আবিষ্কার। তার আগেও মানুষ লিখেছে গ্রন্থ গত আকৃতি ও গঠন যার নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন পুরাতত্ত্ববিদেত। সুমেরীয়, আসিরীয়, ব্যাবিলনীয় প্রমুখ সভ্যতার কীলকাকৃতি বা (Cuniform) লিপি খোদিত হাত মাটির চাকতির উপরে ছুঁচালো কোন ধাতু বা হাতির দাঁত বা কীলক জাতীয় কাঠের খন্ড দিয়ে লেখা হয়ে যা বার পরে মাটির চাকতি গুলো পুড়িয়ে শক্ত করে নেওয়া হত। সে যুগেরই প্রচুর মাটির চাকতি গ্রন্থ পুরাতাত্ত্বিকদের আবিষ্কার ধরা পড়েছে। তার পরেই পাই আসিরীয় রাজা অসুরবানিপালের নিনেভের গ্রন্থের জোড়া প্রচুর চাকতি গ্রন্থ। এইভাবে কিউনিফর্ম থেকে হায়ারোগ্লিফ লেখামালার প্রচলন হয়েছিল।

হায়ারোগ্লিফ হল এটা মিশরীয় সভ্যতায় দেখা যায় যা-চিত্রকেন্দ্রিক লিপিমালা শব্দটির উৎপত্তি আছে গ্রিকশব্দ (hieros) অর্থাৎ পবিত্র এবং (glyphein) অর্থাৎ খোদাই। কোন চিন্তার প্রতিরূপ হিসাবে এক একটি ছবি আঁকত-এই ছবি একে কয়েকটি শব্দ প্রকাশ পেত। এই রকম সাত'শ বিভিন্ন শব্দের সমারহে গঠিত এই ভাষা। এবারে বলবো বই কি? এবং কিভাবে উৎপত্তি হয় -বই এর 'পাতা' এবং 'পত্রাঙ্ক' কথাটির উৎপত্তি লিখিবার উপকরণ এই পাতা বা পত্র থেকে। আর লিখিত পত্রপুঞ্জ এক সঙ্গে গাঁথা বা (গ্রন্থিত) হয় বলে এর নাম - গ্রন্থ'।

বই শব্দটি এসেছে আরবি 'বহী' থেকে যার অর্থ দৈবঅনুজ্ঞা। আর 'পুস্তক 'কথাটির মূলে আছে পারসিক "পুস্ত" (pust) অর্থাৎ চামড়া থেকে উৎপন্ন। এবার সঠিক ভাবে বা সজ্ঞায়িত ভাবে বই কাকে বলা হয়? বই কথাটি এসেছে আরবি শব্দ "বহী" থেকে।

দুই পাশে দুই মলাটের মধ্যে গ্রথিত –মুদ্রিত পাঠ্য সামগ্রী বই নামে পরিচিত। ২)আরো ভাল ভাবে বলা যায় মুদ্রিত, সজ্জিত ও গ্রথিত পত্র পুঞ্জকেই বলে গ্রন্থ, বই বা book, অর্থাৎ দুই মলাটের মধ্যবর্তী পত্রসমষ্টি তবে প্রশ্ন আসবে-পুস্তক এবং পুস্তিকা অর্থাৎ বই এর ইস্তাহার জাতীয় রচনার প্রভেদ বিবেচনীয় খুব মোটা বই যেমন পুস্তক, খুব চটিবই ও তেমনি পুস্তক। প্রভেদ মূলত অন্তর্নিহিত বিষয় বস্তু নিয়ে। এইভাবে বিভিন্ন বাদানুবাদের পরে-UNESCO একটা হিসাব বেঁধে দিয়েছে 49 পৃষ্ঠার কম হলে সেটি বই বলে গণ্য না হয়ে পুস্তিকা (pamphlet) শ্রীনিভুক্ত হবে। কানাডা, আমেরিকা প্রভৃতি, কিছু কিছু দেশ এই হিসাব মেনে চলে।

ইংরেজদের হিসাব আবার অন্য রকম, যার দাম অন্তত 6 পেনি সেটাই বই। ভারবর্ষেতে এমন স্পষ্ট কোন নিয়ম চালুনেই। পুস্তিকা ও অনেক ক্ষেত্রেই বই হিসাবে চলে যায়। বলা যেতে পারে 49 পৃষ্ঠার নিয়ম মানতে গেলে বহু কবিতার বই- ই গ্রন্থাগারের তাকে তালিকা বিন্যাস অনুযায়ী সজ্জিত হবে না বা ঠাঁই পাবেনা ।

প্রথম বই এর সন্ধান কিভাবে আসে। আধুনিক কালের যুগান্তরকারী আবিষ্কার সচল হরফ (Movable type)। প্রতিটি হরফ স্বতন্ত্র ভাবে খোদাই করে সাজিয়ে সাজিয়ে বা কি গঠন করে ছ'পান। এই পদ্ধতির আবিষ্কারক হিসাবে জার্মানির' যোহান গুটেনবার্ক (Gutenburg) এবং হল্যান্ডের লরেন্সকস্টার রের নাম যুক্ত আছে।

গুটেনবার্গ জার্মানির মাইনজ শহরে এটি চালু করেন পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তাঁর মুদ্রিত 'বিয়াল্লিশ পংক্তির বাইবেল 'বিখ্যাত'। ইংল্যান্ডের প্রথম মূদ্রাকার উইলিয়াম ক্যাক্সটন (William Caxton) তাঁর প্রথম

মুদ্রিত বই বেরিয়ে ছিল 1477 খ্রিস্টাব্দে। ভরতবর্ষে প্রথম ছাপাখানা খোলেন পর্তুগিজ মিশনারিরা গোয়াতে, সম্ভবত 1556 খ্রি:। 1557 তে জন দ্য বুস্টামেন্ট ছাপান দট্রিনা ক্রাইস্টা। 1577 –এ ত্রিচুরে প্রথম তৈরী হয় মালাবার হরফ। বাইবেলের তামিল অনুবাদ ছাপা হয় 1711 খ্রি: এবং এই সময়ে মাদ্রাজের ট্রেকোয়ারার শহরে বসে প্রথম কাগজ তৈরীর কল। তবে এর আগে ভীমজি পারেখের চেষ্টায় 1674 খ্রি: বোম্বাই শহরে প্রথম মুদ্রণ যন্ত্র চালু হয়েছিল। বাংলা হরফের প্রথম ব্যবহার হয় 1778 খ্রি : প্রকাশিত নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেদ রচিত ‘এ গ্রামর অফ বেঙ্গলি লেঙ্গুয়েজ ‘{[ইংরেজি ভাষায় লিখিত এই বই এর উদাহরণ উদ্‌ধৃতি গুলি ছিল বাংলা হরফে}] এই হরফ তৈরী করেন জন উইলকিন্স - যাঁর সহকারী ছিলেন পঞ্চানন কর্মকার। অবশ্য এসম সময়ে লন্ডনে বসে উইলিয়াম বোল্টস বাংলা হরফের ছাঁচ তৈরী করে ছিলেন। এরপর উইলিয়ামের তত্বাবধানের কলকাতার কোম্পানি প্রেস থেকে ছাপা হয়। প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা বই জোনাথন ডানকানের ‘ইম্পেকোড' এর বঙ্গানুবাদ (English Book). ইতিমধ্যে পত্রিকা কেন্দ্রিক কিছু ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছে এবং ক্রনিকল প্রেসটি মুদ্রিত হয়ে বেরিয়েছে আপনজনকৃত প্রথম ইংরেজি বাংলা বিধান- ইংরেজিও বাঙ্গালী বোকেবিলারি-1793 বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত ও বাংলা হরফকে মর্যাদাদেন ‘উইলিয়াম কেরী' তাঁর বাংলা বাইবেল ছাপা হয় 1801 খ্রি: শ্রীরামপুর মিশনারি প্রেসে। উইলকিন্সের সহকারী পঞ্চানন কর্মকার ও তাঁর জামাতা মনোহর এই দক্ষ করিগরিগরের হাতে বাংলা হরফের ছাঁচ ঢালাই হল এবং হরফ তৈরী হল। 1832 খ্রি : মধ্যে কেরীসাহেব ‘দু ‘ লক্ষ বারো হাজার বই ছাপিয়ে ফেলেন। কেননা এর মধ্যে 1779 খ্রি: ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়েছে এবং তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় বই লিখিত এবং মুদ্রিত হতে থাকে শ্রীরামপুর মিশনে। প্রত্নতত্ত্বগত প্রমাণে বিশ্বের প্রথম গ্রন্থাগারের পরিচয়' পাওয়া যায়- ব্যাবিলনীয় সেমেটিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম সারগনের (Sargon - I) রাজধানী - আক্কাদে (Akkad) অথবা আগাদে (Agade) আনুমানিক খ্রি: পূর্ব সপ্তম শতকে এই গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল। বিশ্বের প্রথম গ্রন্থাগারিকের যে নাম পাওয়া যায় তিনি ব্যাবিলনীয়, তাঁর নাম (আমিলানু) Amilanu ভারতের গ্রন্থাগারের ইতিহাস শুরু হয় বৌদ্ধ সভ্যতার শেষ অধ্যায় থেকে গ্রন্থাগারের উৎস খুঁজে পাওয়া যায় পালি শব্দ ‘পিটক' থেকে। হস্তলিখিত বিষয়ের পাণ্ডুলিপি পিটকে রাখা হত। ‘সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রথমচিন্তা করেছিলেন জুলিয়াস সিজার — সকলেই লেখাপড়া শিখুক এই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রাচীন গ্রন্থাগার মূলত গ্রন্থের সংগ্রহ, প্রচলিত অর্থে আমরা তাই বুঝি। কিন্তু গ্রন্থ বা বই কি ? বই হচ্ছে মানুষের দেখা জানা বা অভিজ্ঞতার লিখিত দলিল।

আধুনিক সভ্য মানব সমাজের পার্থক্য সূচিত করেছে লেখার আবিস্কার। যুগ থেকে যুগান্তরে মানুষের জ্ঞান ও তার কর্ম কীর্তিকে পৌঁছবার কাজে কথ্য ভাষা অপারগ। তাই আজ থেকে বিশ বা তিরিশ হাজার বছর আগে প্রস্তর যুগের মানুষ গুহায় অংকন করে, পাহাড়ের গাইয়ে খোদাই করে তাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার কথা অপর যুগের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

ল্যাটিন ভাষায় এই গ্রন্থের নাম ছিল কোডেক্স (Codex), যার নাম থেকে এসেছে কোড (Code) কথাটি গ্রিস ও রোমের প্রবর্তিত লেখার কায়দা ও বর্ণমালা পদ্ধতি সভ্য জগতে বিশেষ দান। গাছের ছালকে পরিষ্কার করে নিয়ে তাঁর উপর লিখেছে প্রায় সকল দেশেরই লিখিয়েরা। ক্লদিয়ারা (Chaldes) গাছের ছালকে বলত (Liber), এই থেকে লাতিন লিবর (Libre) যার মানে “বই” বা “গ্রন্থ” বর্তমানে গ্রন্থাগার বলতে কি বোঝায়? গ্রন্থাগার হল পাঠোপযোগী মুদ্রিত ও মুদ্রিত সকল সংগ্রহ এবং দৃশ্য ও শ্রাব্য সকল সংগ্রহের সমষ্টি। গ্রন্থগার কথাটি ইংরেজি "Library ‘শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ, ইংরেজি, "Library' শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন 'Librarium' শব্দ থেকে " Librarium কথাটির মানে "a book case "(গ্রন্থধার) যাহা বর্তমান ও অতীত গ্রন্থাগার এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সম্পর্কে যে মননশীল হৃদয়গ্রাহী প্রাণবত্ত আলোচনা করেছেন বর্তমান যুগেও যে কোন গ্রন্থাগার অনুরাগী মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। সাহিত্য, সঙ্গীত, শিক্ষা, রাজনীতি, দর্শন, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা বারবার আমাদের বহুভাবে ভাবিত করেছে। তিনি গ্রন্থাগার সম্পর্কে যে দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন সেগুলি আজও সমাজ জনপ্রিয়। ‘লাইব্রেরি’ এবং ‘লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য' ছাড়াও গ্রন্থাগার নিয়ে ভাবনার কথা তাঁর বিভিন্ন রচনায় দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথের লেখা ‘লাইব্রেরি' প্রবন্ধটি ‘বালক' পত্রিকায় ১২৯২ বঙ্গাব্দে (১৮৮৬ খ্রিঃ) পৌষ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এবং পরে তা ‘বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রবন্ধে লেখক গ্রন্থের তাৎপর্য তুলে ধরেছেন। গ্রন্থ কীভাবে যুগ যুগ ধরে নিঃশব্দে মানব ইতিহাসের উত্থান পতনকে ধরে রেখেছেন তা চিন্তা করে তিনি অভিভূত হয়েছেন। আর ‘লাইব্রেরির প্রকৃতি কেমন হলে গ্রন্থাগারের সার্থকতা সে সম্পর্কেও তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। বঙ্গবাসীর যা কিছু বলার ছিল, তা রবীন্দ্রনাথ একাই বলেছেন। বাঙালির কণ্ঠকে বিশ্বের দরবারে তিনিই পৌঁছে দিয়েছেন।

'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য' প্রবন্ধটি ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে (১৯২৮ খ্রিঃ) 'প্রবাসী' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। এখানে তিনি জানিয়েছেন, গ্রন্থাগার – পাঠকের সম্পর্কের কথা। গ্রন্থাগারিকের গ্রন্থবোধ, পাঠকের চাহিদা মেটানো, পাঠক বৃদ্ধির কৌশল এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে গ্রন্থাগার পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর ধারণা প্রকাশ করেছেন।

১৮৮৬-১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের অনেক পরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ডঃ শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথন গ্রন্থাগার বিষয়ের উপর পঞ্চনীতি (Five Laws of Library Science) আবিষ্কার করেন। রঙ্গনাথনের আগেই রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ঐ পঞ্চনীতির ভাবনাকে প্রকাশ করেছিলেন নিজে গ্রন্থাগার বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত না হয়েও গ্রন্থাগারের হৃদয়ের কথাটি বলে গেছেন। পরবর্তীকালে রঙ্গনাথন যে 'পঞ্চনীতি' আবিষ্কার করেন তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মূল তত্ত্বের বেশ মিল দেখতে পাওয়া যায়। যেমন:

রবীন্দ্রনাথ বই সাজিয়ে রেখে সংখ্যা বৃদ্ধি করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বই ব্যবহারের কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করার কথা বলেছেন। যথা—"লাইব্রেরি তার যে অংশে মুখ্যতঃ জমা করে সে অংশে তার উপযোগিতা আছে, কিন্তু যে অংশে সে নিত্য ও বিচিত্র ভাবে ব্যবহৃত সেই অংশেই তার সার্থকতা"– (লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। গ্রন্থাগারকে পাঠকের হৃদয়ের কাছে পৌঁছানো, গ্রন্থ সংগ্রহ প্রত্যেক বিষয়ের উপর তিনি জোর দিয়েছেন। লাইব্রেরিকে সংগ্রহশালা না করে তাকে সক্রিয়ভাবে পাঠকের অন্তরলোকে পৌঁছানোর দায়িত্ব নিতে হবে। রবীন্দ্রনাথের উক্তির মধ্যে রঙ্গনাথের বই ব্যবহারের জন্য' নীতিটি রয়েছে।

প্রত্যেক ধরনের পাঠকের জন্য গ্রন্থাগারে বই সংরক্ষিত থাকবে। শিশু, কিশোর, বয়স্ক প্রত্যেকের উপযোগী বই লাইব্রেরিতে রেখে পাঠককে আকৃষ্ট করার জন্য লাইব্রেরিয়ানকে সচেষ্ট হতে হবে। রবীন্দ্রনাথের কথায়,–'যে লাইব্রেরির মধ্যে তার আগ্রহের পরিচয় পাই, যে নিজে এগিয়ে গিয়ে পাঠককে অভ্যর্থনা করে আনে, তাকেই বলি বদান্য—সেই হল বড়ো লাইব্রেরি-আকৃতিতে নয়, প্রকৃতিতে। শুধু পাঠক লাইব্রেরি তৈরি করে না নয়, লাইব্রেরি পাঠককে তৈরি করে।"—অর্থাৎ 'প্রতিটি পাঠকের জন্য বই'—এই উক্তিরই স্বীকারোক্তি পাই রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে।

লাইব্রেরিতে সেই সমস্ত বই-ই রাখা উচিত যেগুলি পাঠকের চাহিদা বেশি। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে গ্রন্থাগারে "সকল বিভাগের বই থাকবে, কিন্তু একেবারে চোখা চোখা বই...আর লাইব্রেরিয়ানের থাকবে গুদাম রক্ষকের যোগ্যতা নয়, আতিথ্য পালনের যোগ্যতা।'—এইভাবে রঙ্গনাথের তৃতীয় নীতির প্রবর্তন করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ লাইব্রেরিকে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য নয়, সক্রিয়ভাবে ডাক দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন—"বিশেষ পাঠ্য প্রবন্ধগুলিকে শ্রেণী বিভক্তভাবে নির্দিষ্ট করে একটা তালিকা পাঠগৃহের দ্বারের কাছে ঝুলিয়ে রাখেন তা হলে সেগুলি পাঠের সম্ভাবনা বাড়ে।"—অর্থাৎ কম সময়ে তার প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারে এবং পাঠক সেট পাঠ করতে আগ্রহী হয়। রবীন্দ্রনাথের উক্তির মধ্যে রঙ্গনাথনের 'পাঠকের 'সময় বাঁচাও' নীতি অন্তর্হিত আছে।

গ্রন্থাগার যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত সম্পদকে প্রাণ থেকে প্রাণে সঞ্চারিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,– "তাঁর জানা থাকা চাই, বিষয় বিশেষের জন্য প্রধান অধ্যয়নযোগ্য কী কী বই প্রকাশিত হচ্ছে।" আবার তিনি জানিয়েছেন — বিশেষ বিশেষ বিষয়ে যে কোনো বই বৎসরে বৎসরে খ্যাতি অর্জন করে তার তালিকা লাইব্রেরিতে বিশেষভাবে রক্ষিত হলে একটা অত্যাবশ্যক কর্তব্য সাধিত হয়।"গ্রন্থাগারের স্থিতিশীল অবস্থা নয়, চলমানতার মধ্যে দিয়েই আজকের ক্রমবর্ধনশীল গ্রন্থাগারের জন্য হয়েছে। রঙ্গনাথনের পঞ্চমনীতিকে রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় অনেক আগেই পাওয়া যায়।

গ্রন্থাগার নিয়ে চিন্তা ভাবনার যে ধারাটি চলছে সেখানে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা এবং রঙ্গনাথনের পঞ্চনীতি এক সূত্রে বাঁধা আছে। গ্রন্থাগার সম্পর্কে মূল তত্ত্বটিই তাঁরা প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা, সামাজিক প্রেক্ষাপট, উন্মাদ প্রতিযোগিতার যুগে লাইব্রেরিতে গ্রন্থ থাকলেও পাঠক সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ার পরিবর্তে কমে যাচ্ছে। কত কম সময়ে, কম পড়ে উচ্চ ডিগ্রি লাভ করা যায় তার আপ্রাণ চেষ্টা করছে আজকের যুবসমাজ। সমাজ অবক্ষয়ের যুগে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থভাবনা সম্পর্কে গ্রন্থপ্রেমী এবং ঐ পেশায় যুক্ত মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

তথ্যসূত্র :

1. Encyclopeadia of Library and Information Science. (1970). New York: Marrcel, Dekkar.
2. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরভী (2011) গবেষণা: প্রকরণপদ্ধতি, কলকাতা: দেজ।
3. শেখ মকবুল ইসলাম (2012) গবেষণা পদ্ধতিবিজ্ঞান: সাহিত্য -সমাজ -সংস্কৃতি, কলকাতা:বঙ্গীয় সাহিত্য পুস্তক।
4. মুখোপাধ্যায়, রাজকুমার, (1963) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অভিধান, কলকাতা: ওয়ার্ল্ডপ্রেস
5. মহাপাত্র, পীযূষকান্তি (1994) গ্রন্থাগার সংগঠন কলকাতা: ওয়ার্ল্ডপ্রেস ।
6. দাস, আসিতাভ (2016), গ্রন্থনীড় .কলকাতা: বুকস হেভেন পাবলিকেশন ।
7. চক্রবর্তী, ভুবনেশ্বর, (2010), গ্রন্থাগার ও সমাজ, কলকাতা: ওয়ার্ল্ড প্রেস ।
8. বন্দোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চন্দ্র, (1968), গ্রন্থাগারবিদ্যা, কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স ।
9. ওহদেদার, আদিত্য, (1958) গ্রন্থবিদ্যা, কলকাতা: বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
10. হালদার, গৌরদাস, (1968) শিক্ষন প্রসঙ্গে সমাজ বিদ্যা, কলকাতা:বেনার্জী পাবলিশার্স ।
11. সিরাজুল ইসলাম শম্পা, (2003), বাংলাপিডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ (খন্ড -6), ঢাকা:বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ।
12. বাংলাপিডিয়া: ন্যাশনাল এনসাইক্লোপিডিয়া অফ বাংলাদেশ //www.banglapedia.org.
13. চ্যাটার্জী, মাধব চন্দ্র ও শাখরু, নির্মলেন্দু, (2003) গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের অভিধান, কলকাতা:প্রভ প্রকাশনী ।
14. লাইব্রেরি-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
15. লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর